বুলবুলি

মখদুম আজম মাশরাফী

বুলবুলি ওর নাম। না কোন মধুরকণ্ঠী পাখী নয় সে। এ এক কর্কশকণ্ঠী, সদা বিরক্ত, উচ্চস্বর তরুণীর নাম। আমাদের পাড়ার সে ছিল সবার অতি পরিচিত একটি মুখ। আমাদের বাড়ী থেকে বাজার যাওয়ায় রাস্তার একধারে ছিল ওর ছোট্ট ঝুপড়ি ঘর। সাহা, দত্ত আর সর্বজ্ঞ পরিবারগুলির ঘনবসতির মধ্যেই ছিল পৃথক করা তার আবাস। তার নিজের ভাই কাছু সাহা তাকে তাদের পৈত্রিক বাড়ীর একটি কোনে ৩ ফুট ৫ ফুট একটি জায়গায় তাকে থাকতে দিয়েছিল। ক'খানা ঢেউ টিন দিয়ে ছাদ। বাঁশের বেড়ার ঝুপড়ি। তাতে কোন জানালা নেই। রাস্তার ওপর বাইরের দিকে ওর ঝুপড়ির বাঁশের একপাল্লা 'ঝাপ' মানে দরোজার কপাট।

বালকবেলায় যখন থেকে বুঝতে শিখেছি বুলবুলিকে দেখেছি ও' ঘরে থাকতে। বিধবার বসন পরা। সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে হাসি মুখ করে বুলবুলি আমাদের আদর ছড়িয়ে দিতো। জিজ্ঞেস করতো কুশল বিষয়। ফেরার পথেও কখনও বসে থাকতে দেখেছি দরোজায়। আবার কখনও দেখেছি ও কোথাও গেছে।
সাঁঝবেলা বাজার থেকে ফেরার পথে ওর ঘরে দেখেছি জ্বলছে সলতের কুপি বাতি। উনুনে রান্না চলছে। বাঁশের বেড়ায় ফাঁকে ফাঁকে অথবা খোলা আলগানো দরোজা দিয়ে সহজেই চোখে পড়ে। কখনও ঘর থেকেই তার বউদির সাথে ওকে আলাপ করতে শুনেছি যা রাস্তা থেকেই তা সহজেই শোনা যেতো।
হঠাৎ কখনও ওকে সরব হয়ে উঠতেও দেখেছি। শুনেছি ওর কর্কশ তীব্র কণ্ঠস্বর। তর্ক করছে উচ্চস্বরে। গালি দিচ্ছে, অভিশাপ দিচ্ছে প্রতিপক্ষকে। অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে দেখা না গেলেও, বুলবুলির কণ্ঠ বহুদুর পর্য্যন্ত শোনা যেতো। চলতো বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তারপর ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসতো। ছিমিয়ে পড়তো সন্ধ্যায় অন্ধকারে, রাতের গভীরতায় ।বিড় বিড় করতো বুলবুলি, তারপর কখন কোন ক্লান্তিতে কুপি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়তো সে।

এই থানা মফস্বল লোকালয়ের মানুষদের সবাই প্রায় সবারই চেনা শোনা। আমাদের বাড়ীটি সাহাপাড়ার এই দিকটিতে। আমাদের অনেক পুরুষের বাস উত্তর জনপদের সীমান্তবর্ত্তী এই ডোমারে হলেও আমার বাবারা তাদের তিন ভাই, চিকনমাটি-ধনীপাড়ার দাদুর ভিটেতে ছোট ভাইকে রেখে দোলা পেরিয়ে এই সাহাপাড়ায় উঠে এসেছেন ।সে তখন পাকিস্তানের নবীন বয়সে। ৪৭ এর দেশভাগের জের ধরে হিন্দু অভিজাত পরিবারেরা একে একে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে গেছেন পশ্চিম বাংলায় । আব্বার ছেলেবেলার সহপাঠিরা বিক্রি করে গেছেন তাদের বসতি । তাই এ পাড়া এখনও হিন্দু অধ্যুষিত।

এরা খুব সরলপ্রাণ সাধারণ হিন্দু। এদের পরিবারের তরুনদের মধ্যে কেউকেউ অবশ্য ওপারে চলে গেছেন নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্যে। ছোটবেলায় আমার খেলার সাথীদের মধ্যে নিজেদের চাচাতো ভাইবোনদের একটি বিরাট দল ছাড়াও ছিল হিন্দুপাড়ার ছেলেমেয়েরা । রাস্তায় লাট্টু ,মার্বেল, এক্কাদোক্কা খেলা ছিল সেই সরলমতি জীবনের খুবই প্রিয় সময়যাপন। রাজকুমার সাহা বাবুর বাড়ীর সুপ্রাচীন পাঁচিলের পাশে আমাদের প্রতিবেশী বাঞ্চা কাকাদের বাড়ীর বেড়ার ওপর দিয়ে ঝুকে থাকা হলুদ আর গোলাপী কবরী গাছের নীচের ছায়ায় মসৃন মাটির রাস্তার ওপরে আমরা খেলতাম লাটিম আর মার্বেল। কখনও এক্কাদোক্কা আর ফুর্তি-ঠান্ডি। মীনা,ভানু,সোহাগী,দুলু,বিশ্বনাথ ছিল সমবয়সী খেলার সাথী।বুলবুলি প্রায়ই বেড়ার ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে দেখতো আমাদের শিশুবেলার খেলাধুলা আর দৌড়ঝাপ। ওর মুখটা ভরে থাকতো উদ্ভাসে।আনন্দ আলোকিত করতো ওর সেই সময়টুকু। নানান কথা বলতো আমাদের সাথে। আমাদের হুল্লোড়-উল্লাসে ও'ও যোগ দিত। আমাদের ছুঁতে ওর নিষেধ থাকলেও ওর আদরের প্রকাশ সহজেই বুঝতে পারতাম আমরা সবাই।

অন্যসময় বুলবুলিকে কাপড় শুকোতে দেখতাম, জীর্ণ পুরোনো পূজো মন্ডপের ইটের স্তুপের কাছে। শীত দুপুরে রোদে চুল মেলে দিয়ে ও নিতো প্রকৃতির প্রেম আর আদর। ওর ঔ অস্পৃর্শ্য জীবনে এই বুঝি ছিল ওর সর্বময় পাওয়া।

এ পাড়ায় অনেক বৌদি আর কাকীমারা ছিলেন। এরা সবাই ব্যবহার করতেন একটি বিশাল ইন্দারা। বাঁশের বেড়া ঘেরা এই ইন্দারাটি ছিল এ পাড়ার প্রতিদিনের সামাজিক মৈত্রী মেলা।ইন্দারার অন্যধারে ছিল আরেকটি জীর্ণ মহাকালী মণ্ডপ।সিঁথিতে খুব উজ্জ্বল সিঁদুরে রাঙানো এ'দের সবাইকে খুব প্রাণবন্ত মনে হতো। স্নান সেরে উদোল গায়ে শাড়ী পেঁচিয়ে এরাও সূর্যস্নানে কথোপকথনে সময় কাটাতেন। বুলবুলিকে এই মেলায় মানাতো না তেমন। যদিও বুলবুলি বয়সে তরুণী, ওর সিঁথিতে নেই সিঁদুরের রক্তবর্ণরেখা অথবা নেই শাড়ির রঞ্জন উৎসব। ও একটু দূরত্বে দাঁড়িয়ে তবুও হয়ে উঠতো এই চিত্রের একটি সুখী সুখী অংশ।
আমাদের গৃহস্থ বাড়ীর প্রায় ৩ বিঘা জমির আয়তনের মধ্যে পুকুর, ফল বাগান। হিন্দু পরিবারের সবাই ভোরবেলা এ বাড়ীতে আসতেন পূজোর ফুল নিতে। খুলতিতে আমার মায়ের সাথে ওদেও কুশল বিনিময় হতো। সদ্যস্নাতা, সিঁদুর রাঙা বৌদিদের অথবা কাকীমাদের কেউই বাদ যেতেন না। এমনকি বুলবুলিও না।পূজোঘর আর উঠোন লেপার জন্যে জন্যে গোবরও এরা নিতেন আমাদের গোয়াল থেকে।
আমার বাবার অবসর জীবনের সময় যাপনের স্থান ছিল সুপরিসর পুকুরের পানির ওপরে শালের খুটির ওপরে গড়া বাঁশের একটি গদি ঘর। পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের প্রিয় ছিল আমার বাবা। দিনে দিনে আমরা হেসে খেলে বেড়ে উঠেছি এই আনন্দ ভুবনে। সবই চলেছে নিয়ম মত। বুলবুলিকেও দেখেছি পরিবর্ত্তনহীন। পাড়ায় কখনও কারুর মৃত্যু অথবা বিয়ের উৎসব ঘটেছে। এসেছে বারো মাসে তেরো পার্বন। দুর্গাপূজা, লক্ষীপূজা, কালীপূজার আনন্দলহর। শীতে, সন্ধ্যায় লক্ষীপূজায় দত্ত আর সাহাবাড়ীতে বসেছে কীর্ত্তনের আসর।তুলসীতলায় শঙ্খনাদ আর মাগরীবের আযানের সুরে বাদুড় আর পাখীদের সাথে সবাই ঘরে ফিরেছি প্রতি সাঁঝবেলা। নবান্ন, রাখী উৎসব,ঈদ, শবেবরাত, মহররম, রমজানে আমরা একে অন্যের সাথে ভাগাভাগি করেছি আনন্দ উৎসব। তবু সবগুলিতে বুলবুলিকে দেখেছি একটু দুরে থেকে হাসি মুখে সামিল হতে।

একটু বড় হয়ে জেনেছি বুলবুলির আছে কুষ্ঠ রোগ। ওর ভাই, সমাজ তাকে অস্পৃর্শ্য করে পৃথক করেছে,বঞ্চিত করে পরিত্যাগ করেছে। ওর কোন কালে বিয়ে হয়েছিল কি না তা কখনও জানতে পারিনি। ওর বৈধব্য বসনের রহস্যও রয়ে গেছে চির অজানা। বুলবুলির কুষ্ঠ সেরে গেলেও সমাজের কুষ্ঠ ব্যধি সারেনি কখনও। তাই বুলবুলির অস্পৃশ্য জীবনও তেমনি অপরিবর্তিত থেকেছে চিরটাকাল।

দশ মাইল পথ দুরে নীলফামারীতে ড্যানিশ বাংলাদেশ মিশন খুলেছিল কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র। বুলবুলি ট্রেনে চেপে প্রতি মাসে যেতো মিশনে চিকিৎসা নিতে। ক্রমে ক্রমে সে পায় তার রোগ মুক্তি। শুধু থেকে যায় তার পায়ের কটি আঁঙুলের বিকলাঙ্গতা। এ ছাড়া বুলবুলি ছিল সর্ম্পূণ রোগমুক্ত, নিরোগ ও সবলা মহিলা।
স্কুল শেষে লেখাপড়ার জন্যে ডোমার ছেড়ে চলে যাই ঢাকায়। এদিকে পাড়ায় খেলার সাথী মেয়েদের একে একে বিয়ে হয়ে যায় শাঁখ আর ঢাক ঢোল বাজিয়ে সিঁদুর শাঁখায় সাজিয়ে। শোলার টোপর পরা বর আসে ওদের বরযাত্রী নিয়ে। ঢাকার পড়াশোনা শেষে তারপর ফিরে আসি রংপুর মেডিকেলে। আমাদের বাড়ী থেকে মাত্র ৫০ মাইলের পথ। ছুটিছাটায় প্রায়ই তাই বাড়ী যেতাম। রেলষ্টেশনের কাছেই ১০ মিনিটের হাটাপথের কাছেই আমাদের বাড়ী। ট্রেন থেকে নেমে যেতাম সেই চিরচেনা পথ ধরে।বুলবুলি পরিবারের একজন হয়ে সেই সদা হাসি মুখ আনন্দে ভরিয়ে বলতো, 'ওরে তুতুল ভাল আছিস ভাই? ভগবান তোদের মঙ্গল করুক।'

তারপর ডাক্তার হয়ে রোজগার করতে শুরু করলে বাড়িয়ে দিই ওকে নিয়মিত দেয়া 'দর্শণীর' পরিমান। বাড়ী ফেরার আগে বাবা , মা, ভাই বোনের জন্য উপহার কেনার সময় কখনই ভুল হতো না ওর জন্যে কিছু অর্থ

পৃথক করে রাখা। কারণ ওর জীবিকার উৎস ছিল অনুদান থেকে। আমার জীবন চিত্রের, পাত্রপাত্রীদের মধ্যে কোন অজান্তেই বুলবুলির স্থানও অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল তা বেশ বিস্ময়কর।

দেশ ছেড়েছি প্রায় চবিবশ বছর পেরিয়ে গেছে। যখন মালদ্বীপে কাজ করতাম, সে তিন বছরের প্রতি বছরেই দেশে গিয়েছি বাবা, মা, পরিজনের সঙ্গে ছুটি কাটাতে। তারপর অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরেছি প্রায় দশ বছর কাটিয়ে। প্রধান কারণ ছিল বাবা, মা আর বেঁচে ছিলেন না। ফেরার সে বছরটি ছিল ১৯৯৬ সাল।,সে সময় ব্যথিত হয়েছি আমূল বদলে যাওয়া পরিবেশ পরিজন দেখে। যেন কোন সর্বনাশা তুফান তছনছ করে গেছে সেই সাজানো সুন্দর ফেলে রেখে আসা চির চেনা পৃথিবী। যেন যে মাটিতে বাঁধা ছিল প্রাণের তন্ত্রীগুলো তার সব কটি ছিঁড়ে গেছে সেই সর্বনাশা খরা বন্যা আর তুফান ঝঞ্জায়।
বুলবুলিকে তখনও দেখেছি বয়সের বলিরেখায় ভরামুখে সেই চিরআনন্দকে ধরে রাখার চেষ্টা করতে। সেই চির স্নেহাবেশের স্নিগ্ধ মুখ মন্ডলে এগিয়ে এসে বলতে শুনেছি, 'তুতুল তুই কেমন আছিস'। কিন্তু ওর চোখে মুখে স্পষ্ট দেখেছি সময়ের নিষ্ঠুর শাসন । নাকি আমার অবয়বেও ও দেখতে পেয়েছে সর্বনাশা সময়ের অকরুন ছাপ।

অপমৃয়মান আনন্দভুবনের কথা ভেবে আজকাল সততঃই বুকে বাসা বাঁধে বেদনার বরফখন্ডের ভার। ফেলে আসা, হারিয়ে যাওয়া আনন্দ দিন ,প্রিয়জন, প্রিয়মানুষ, প্রিয়স্মৃতি, প্রিয়ভূবনের কথা ভেবে বুকটা ব্যথায় ভরে ওঠে। চোখের কোনে নিভৃতে জমে অশ্রু শিশির। শেষ যেবার দেশে গিয়েছি, সেবার দেশে ফেরার অবশিষ্ট আকর্ষণটুকু বোধ করি হারিয়ে ফেলেছি। নদীতে পড়া চরের বুকে হারিয়ে যাওয়া উৎসবের উর্মিমালারা যেন চৈত্রে উধাও হয়েছে। প্রিয়জনের সেই উষ্ণ সম্ভাষ যেন বোবা কণ্ঠের ক্লান্ত আকুলির মতো মুখ থুবড়ে পড়ে থেকেছে হেলায়। প্রিয় আকাশ ও পৃথিবী, মাটি ও মানুষ যেন অন্য এক জগতে পরিবর্তিত হয়ে অচেনা রুপ নিয়েছে । মনে হয়েছে আমি যেন এক অজানা মানুষ এই লোকালয়ে। ওদের সহমর্মিতাহীন শুষ্কতার ধূলোস্তরের নীচে চাপা পড়ে গেছে আমার শৈশব-বাল্যের চেনা ঘর, উঠোন, মাঠ, বাজার, পরিবেশ ও প্রকৃতি।

বাড়ী ফেরার পথের পাশে লক্ষ্য করেছি বুলবুলির ঝুপড়িটি আর নেই। ওখানে শুধু পড়ে আছে কিছু ছাই আর অঙ্গার। একটি অচেনা বালককে ডেকে বুলবুলির কথা জিজ্ঞেস করে জানতে পারি সেই নিষ্ঠুর খবরটি। কুপির শিখায় একদিন অগ্নিকাণ্ডে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে পুড়ে মরেছে বুলবুলি। চলে আসতে আসতে কানে বাজতে লাগলো বুলবুলির কর্কশ কঠিন কণ্ঠস্বর। সেই সাথে চোখে ভেসে উঠল এই জনারন্যে সর্ম্পূণ´ একাকী একটি তরুণীর তিলে তিলে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া নির্বাসিত, নির্যাতিত, সমাজ কারাগারে বন্দী বুলবুলির স্নেহবৎসল মুখখানি।

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, ১৩জুন ২০০৭

লেখকের আগের লেখাগুলো দেখতে এখানে টোকা মারুন